বনায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

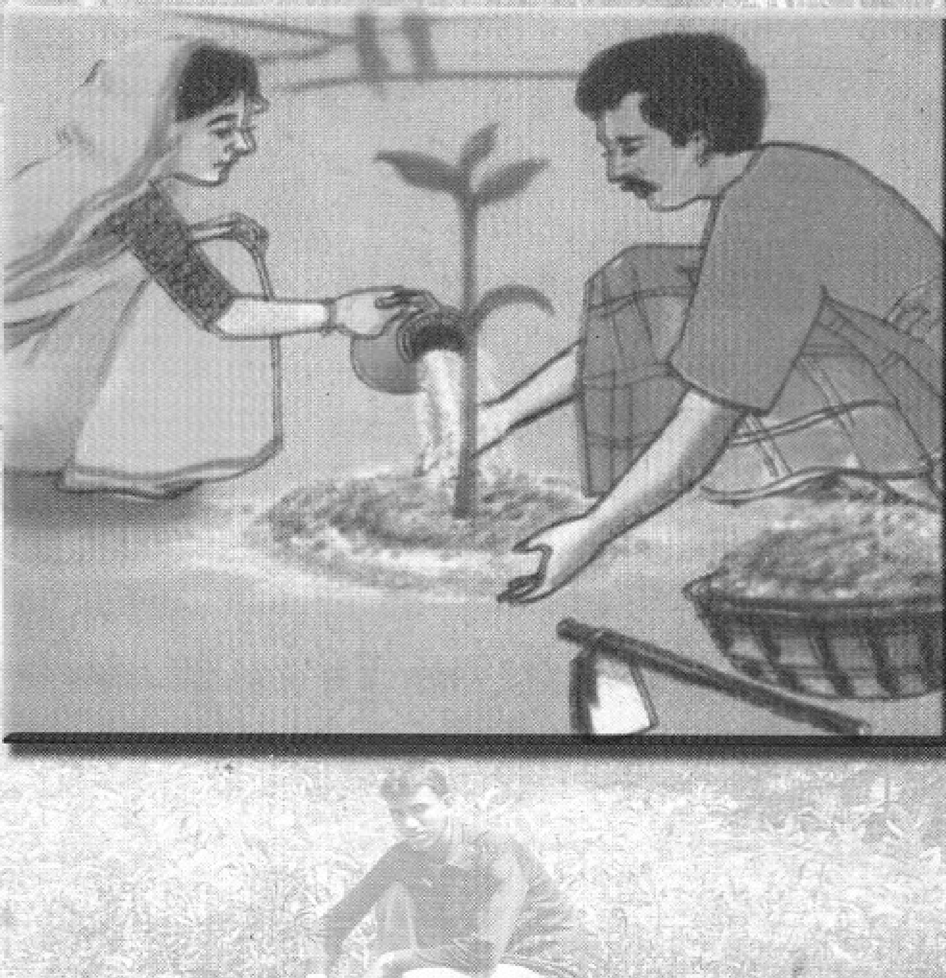

বন অধিদপ্তর

জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০০৯

বনায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০০৯

১৭ জ্যৈষ্ঠ- ১৫ ভাদ্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
৩১ মে- ৩০ আগস্ট ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

রচনা ও সম্পাদনায়

জনাব হারাধন বনিক
বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, ঢাকা

বেগম রায়হানা সিদ্দিকী
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, সামাজিক বন উইং
বন অধিদপ্তর

জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-বন সংরক্ষক, মনিটরিং ইউনিট
বন অধিদপ্তর

তথ্যসেল, জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলণ ও বৃক্ষমেলা ২০০৯
বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশ কাল ঃ ৩১ মে ২০০৯

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ রিনি প্রিন্টার্স
৪৭/এ, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।

সূচীপত্র

১. বনায়নের প্রয়োজনীতা --------৩

২. বনায়নের ধরন --------৩

২.১ বনভূমিতে সরকারী উদ্যোগে বনায়ন --------৩

২.২ গ্রামাঞ্চলে সরকারী/বেসরকারী/ব্যক্তিগত পর্যায়ে বনায়নের প্রজাতি সমূহ -------৪

২.৩ শহর এলাকায় বনায়নের প্রজাতি সমূহ -------৫

৩. বনায়নের জন্য গাছের চারা উত্তোলন পদ্ধতি -------৫

৩.১ নার্সারীতে পলিপটে চারা উত্তোলন পদ্ধতি -------৬

৩.২ নার্সারীতে চারা রক্ষণাবেক্ষণ -------৮

৩.৩ রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন -------৮

৩.৪ নার্সারীতে ছত্রাক দমন -------৯

৪. আগাছা বাছাই, ছত্রাক ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ -------১০

৫. বাগান সৃজন প্রক্রিয়া, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি -------১০

৬. রোপিত চারার পরিচর্যা -------১২

৭. বনায়নের জন্য কোথায় চারা পাবেন -------১৩

৮. উপসংহার -------১৬

১. বনায়নের প্রয়োজনীতা

সুদূর অতীতে পৃথিবীময় সবুজ গাছ গাছালি ও ফুলে ফলে ভরা ছিল। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে মানুষ চাষযোগ্য জমি ও বসতি স্থাপনের জন্য বৃক্ষরাজি নিধন শুরু করে। আমাদের দেশটিও এক সময় গাছ-গাছালিও বন বনানীতে ভরপুর ছিল। কালের বিবর্তনে বর্ধিত জনগোষ্ঠির বনজদ্রব্যের চাহিদা ও আর্থসামাজিক প্রয়োজনে সরকারী বন ও গ্রামীণ গাছ-পালা আশংকাজনক ভাবে কমে যায়। এ অবক্ষয় রোধে এবং পরিবেশের উন্নয়নে বনায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ঝড় তুফান বেড়ে গেছে, খরায় শস্যহানি হচ্ছে, অতিবৃষ্টিতে বন্যা আসছে, গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে তলিয়ে দিবে অনেকদেশ বা দেশের অংশ বিশেষ, অস্বাভাবিক ঋতু পরিবর্তন এসব আজ শংকা নয় বরঞ্চ এর কিছুটা অভিজ্ঞতা আমরা সকলেই অনুভব করছি। আর এসবের জন্য দায়ী করা হয় পরিবেশ বিপর্যয়ের ।

মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার কারনে পরিবেশ যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে উদ্ভিদ বা বৃক্ষ একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে। ভূমির ক্ষয়রোধ থেকে শুরু করে প্রাণীকূলের অক্সিজেন সরবরাহ এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করে এ বন তথাবৃক্ষরাজি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষ তার প্রয়োজনে নিঃশেষ করে চলেছে এ বৃক্ষ সম্পদ। আধুনিকায়ন এবং শিল্প সম্প্রসারণের বলি হতে হয়েছে বিশ্বের বৃক্ষ সম্পদরাজির।আমরা উপলব্দি করতে শিখেছি এবং আজ তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে একমাত্র বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমেই পুনরুদ্ধার করা যাবে ক্ষয়ে যাওয়া এই পরিবেশ। পরিবেশ দুষণ রোধে তাই সরকারী বেসরকারী এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও বনায়নকে পরিবেশ রক্ষায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বনায়নের ধরন

একই জায়গায় বহু গাছপালা ঘন হয়ে জন্মালে সেই জায়গাকে সাধারণ অর্থে বন বলা হয়। বনায়ন বহু ভাবে করা যায়। গাছের ধরণ, বনায়নেরঅবস্থান, বনায়নের সংগে অন্যান্য ব্যবহারে সংমিশ্রন ইত্যাদির মাপকাঠিতে ও বনায়ন ভাগ করা যায়। সরকারী উদ্যোগে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনের মাধ্যমে সরকারী পতিত ভূমি , প্রান্তিক ভূমি এবং বনভূমিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ও মডেলের বাগান সৃজন করা হয়ে থাকে । সরকারী বনভূমিতে স্বল্প মেয়াদী বাগান, দীর্ঘমেয়াদী বাগান, ভেষজউদ্ভিদের বাগান ,উডলট বাগান, কৃষিবন বাগান ইত্যাদি ধরনের বাগান সৃজন করা হয়। সরকারী রাস্তা, রেলপথ ও বাধেঁর ধারে সারিবদ্ধ বাগানসৃজন করা হয়। তাছাড়া সরকারী উদ্যোগে উপকূলীয় এলাকায় ও অন্যান্য এলাকার নতুন চর ভূমিতে উলেখিত বিভিন্ন ধরনের বনায়ন করা হয়।ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে ও শহর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের মিশ্র বাগান, ফলের বাগান, শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদেরবাগান, ভেষজ উদ্ভিদের বাগান সৃজন করা হয়।

২.১ বনভূমিতে সরকারী উদ্যোগে বনায়ন ঃ বনায়নে সরকারী উদ্যোগকে দুভাবে দেখা যায়। একটি হচ্ছে সরকারী বনভূমিতে বনায়ন ও অন্যটি হচ্ছে বনভূমি নয় এমন সরকারী, বেসরকারী ওব্যক্তিগত ভূমিতে বনায়ন। বৈজ্ঞানিক বন ব্যবস্থাপনার ক্রম বিবর্তনের সাথে যখন বনায়নকে বন ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হিসেবে গ্রহন করা হলো তখন এ অঞ্চলেও বনায়ন কার্যক্রম গৃহীত হল। সরকারী বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক বন ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে আজ সফল ভাবেই বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ষাটের দশকের পূর্বে বাগান উত্তোলনের পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প ছিল। ষাটের দশক হতে স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে বনায়ন কার্যক্রম কিছুটা তরান্বিত হলেও বৃহদাকার বনায়ন শুরু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। যাআজও অব্যাহত রয়েছে। সরকারী বনাঞ্চল বনায়ন হাতে নেওয়া হয়েছে বিদেশী সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পের মাধ্যমে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ও সরকারী উদ্যোগ বৃহত্তর পার্বত্য জেলা, চট্রগ্রাম ও সিলেট জেলায় উন্নতমানের বন সৃষ্টি করা হয়েছে। বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী ও রংপুরজেলায় শাল বনভূমিতে শালবন সংরক্ষণ ও নুতন প্রজাতির মাধ্যমে বনায়ন সৃষ্টির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষিবনের সৃষ্টি হয়েছে এ অঞ্চলে। জনগণের কাছে এ কৃষিবনের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের বিস্তৃত উপকূল অঞ্চলে প্রতি বৎসর পলি জমে নুতন চরের সৃষ্টি হয়। উপকূল অঞ্চলের জেগে উঠা এ চরগুলো স্থিতিশীল ও বনাচ্ছাদনের প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে সরকারী প্রচেষ্ঠায় সৃষ্টি করা হয়েছে বিশাল বনরাজির। দেশীয় প্রযুক্তির উপকূলের এ বন সৃষ্টি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের গর্ব। সরকারী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বনায়নের যে প্রেক্ষাপট এবং বনায়নে সরকারী উদ্যোগ যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা বনভূমি নয় এমন সব সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বনায়ন অথবা কৃষিবন করা হচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর আহার ও বাসস্থান যোগাতে নিঃশেষ হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ। বনভূমি পরিস্কার করে তৈরি হচ্ছে আবাসস্থল এবং কৃষি ভূমি । এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আশি দশক থেকে সরকারী প্রচেষ্টায় সামাজিক বনায়নের বিভিন্নকর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করা গেছে। সামাজিক

বনায়নের অন্তর্নিহিত বক্তব্যেই হলো সাধারণ মানুষকে এ কর্মসূচীর সাথে জড়িত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা এবং সেই সাথে জনসাধারনের মধ্যে বৃক্ষ সম্পদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উপকারিতা সমন্ধে সচেতন করা। সামাজিকবনায়নের মাধ্যমে সর্বসাধারনের খামারে, বাড়ীর চারপাশে, বাঁধ, রাস্তা, রেললাইন ও বাঁধের ধারে বনায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দেশেরকেন্দ্রীয় ও উত্তরাঞ্চলের বনের পরিমাণ খুবই সীমিত। অধিকাংশ জেলাই বনহীন। এ বনহীন জেলাগুলোতে ইতিপূর্বে বনায়নের তেমন একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।

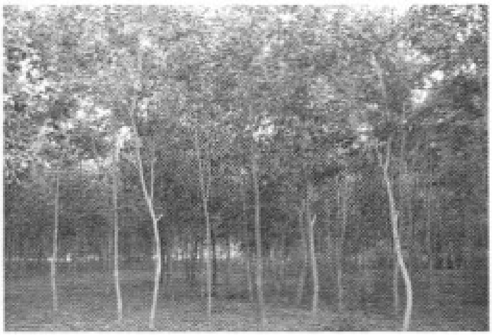

সরকারী উদ্যোগে সৃজিত বাগান

২.২ গ্রামাঞ্চলে সরকারী/বেসরকারী/ব্যক্তিগত পর্যায়ে বনায়নের প্রজাতিসমূহ

১। (ক) গ্রামাঞ্চলেঃ গ্রামাঞ্চলের বাড়ীর আশে পাশে আম, জাম, কাঁঠাল, জাম্বুরা, লেবু, শরিফা, কুল, বেল, আমড়া, করমচা, পেয়ারা, কামরাংগা,নারিকেল, সুপারী, খেজুর, ডালিম, জামরুল, গোলাপজাম, কলা, পেঁপে, জারুল, নিম, জিগা, তুঁত ও বিভিন্ন রকম পাতাবাহার, জবা ও অন্যান্যফুলগাছ রোপণ করা দরকার। বাড়ীর অল্প দূরে বাঁশঝাড় তৈরি করা যেতে পারে। বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে নীচু গাছ এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকেউঁচু গাছ লাগালে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(খ) গ্রামাঞ্চলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানঃ- গেটের দুপাশে দেবদারু, ছায়ার জন্য কম্পাউন্ডে মেহগিনী, বকুল,শিরিশ এবং চারপাশের সীমানায়, কনকচুড়া,কৃষ্ণচুড়া কেশিয়া নডুসা, জারুল, সোনালু, ঝাউ, কাঞ্চন, নাগেশ্বর, নারিকেল, আম, জাম, কাঁঠাল,জলপাই, পেয়ারা, বাতাবী লেবু, জামরুল, খেজুর প্রভৃতি গাছ লাগানো দরকার।

(গ) গ্রামাঞ্চেলের রাস্তাঘাট ও হাট-বাজারঃ- মেহগিনী, বট, পাকুড়, তেলসুর, রেইনট্রি, আম, জাম, মিঞ্জিরি, তেঁতুল, জারুল, খেজুর প্রভৃতি গাছলাগানো দরকার।
(ঘ) গ্রামের স্যাঁতসেঁতে জায়গায়ঃ- হিজল, শিমুল, জারুল, বাবলা, পিটালী, ছাতিম, কদম, গাব, মান্দার, মূর্তা প্রভৃতি গাছ থাকা দরকার।
(ঙ) উচুঁ অনাবাদী ও পতিত জায়গায়ঃ- কাজুবাদাম, খেজুর, আম, কাঁঠাল, শাল, খয়ের, মিঞ্জিরি প্রভৃতি গাছ লাগানো উত্তম।

২। নদী-নালার পাশে বালুকাময় ভূমিতেঃ- শিশু, পিটালী, ছাতিম, কদম, গাব, মান্দার, মূর্তা প্রভৃতি গাছ লাগানো দরকার। ক্ষেতের আলের উপরেখয়ের, বাবলা, শিমুল, তাল প্রভৃতি গাছ লাগানো যেতে পারে।

৩। উপকূলীয় অঞ্চলঃ- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং চট্রগখাম জেলার লবনাক্ত ভূমিতে কড়ই, জাম, শিরিশ, **মান্দার,** বাবলা, শিশু,**খেজুর** ইত্যাদি গাছ লাগানো উত্তম।

৪। (ক) রেল লাইনের ধারে, রেল লাইনের সমতল ভূমিতে ও রেলওয়ের জমিতেঃ- বাবলা, শিমুল, খেজুর এবং খয়ের গাছ লাগানো দরকার।
(খ) সড়ক ও জনপথ সড়ক ও শহরতলীর বাইরেঃ- বকুল, শিশু, কড়ই, ইপিল-ইপিল, মেহগিনী, তেঁতুল, আম, জাম, বট, পাকুর, মহুয়া, প্রভৃতিগাছ এবং নীচের অংশে মূর্তা, নল খাগড়া, বেত, কলমি শাক ইত্যাদি লাগানো উত্তম।
(গ) শহরতলীতে রাস্তার পার্শ্বেঃ- দেবদারু, ঝাউ, সোনালু, কৃষ্ণচুড়া, অষ্ট্রেলিয়ান একাশিয়া, তাল প্রভৃতি গাছ লাগানো দরকার। জনপথ ওরাজপথের এবং শহরতলীতে একই রকমের গাছ সারিবদ্ধভাবে অন্ততঃ মাইল দুয়েকব্যাপী লাগালে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা এবং দেখতে মনোরমহয়।

২.৩ শহর এলাকায় বনায়নের প্রজাতিসমূহ

(ক) শহর এলাকায়(পার্ক এরিয়া ছাড়া)ঃ- উচুঁ গাছ লাগানো উচিত নয়, কারণ উহা ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ব্যবস্থায় এবং যানবাহন ও চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটায়। ইহাতে বাড়ী ঘরের ক্ষতি সাধিত হয় এবং প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে। যে গাছ ঝড়ে সহজে ফেলতে বা ভাংতে না পারে অথচ শহরের সৌন্দর্য বাড়ায় সেরকম গাছ লাগোনোই উচিত। শহর অঞ্চলের রাস্তা ঘাটে জারুল (মাঝারি জাতের) সিলভারওক, সোনালু, নাগেশ্বর, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, ঘোড়া নিম, অষ্ট্রেলিয়ান বাবলা, বিভিন্নজাতীয়পাম গাছ, কেসিয়া নডুসা, পলাশ, মেহগিনী, তেলসুর, অশোক, খেজুর প্রভৃতি একই জাতীয় গাছ সারিবদ্ধভাবে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে লাগালেশহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

(খ) শহরের আবাসিক এলাকায় বাড়ীর পিছন দিকেঃ কাঁঠাল, সুপারী, জাম্বুরা, জামরুল, খেজুর, গোলাপজাম, পেয়ারা, বেল, তুঁত, করমচা,শরীফা, পেঁপে, কলা এবং কলমের লিচু ফল, আম, লেবু, মালটা এবং বাড়ীর সামনের দিকে বিভিন্ন রকমের ফুলের গাছ যেমন- গোলাপ, জবা, হাসনাহেনা, রাজনীগন্ধা, চাঁপা, জুই, চামেলী, বেলী, কলাবতী,বাগান বিলাশ ইত্যাদি অন্যান্য জাতীয় ফুলের গাছ লাগানো উত্তম। ইহা ছাড়াম্যাগনোলিয়া, থুজা, পাতাবাহার, মেহদী এবং বিভিন্ন রকমের রংগীন ফুলের গাছ লাগানো উত্তম।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ছাত্রাবাস, সরকারী ও বসরকারী প্রতিষ্ঠানঃ- কেসিয়া নডুসা, নাগেশ্বর, অশোক, অষ্ট্রেলিয়ান একাশিয়া, সোনালু,কাঞ্চন, ঘোড়া নিম, আমলকি, লিচু, জামরুল, জাম্বুরা, পাম , নারিকেল, খেজুর, কলমের ফল ও বিভিন্ন প্রকার ফুলের গাছ লাগানো দরকার।

(ঘ) শিল্প এলাকায়ঃ- সুবিধা অনুযায়ী ছায়ার জন্য দু'একটা বড় গাছ যেমন-মেহগিনী, বকুল, রেইনট্রি, তেঁুল, রাজকড়ই, খেজুর ইত্যাদি গাছলাগানো যেতে পারে।

(ঙ) বাণিজ্যিক এলাকায়ঃ- যেখানে গাছ লাগানোর মতে প্রচুর জায়গা নেই- মেহগিনী, বকুল, রেইনট্রি, তেঁতুল, রাজকড়ই, খেজুর ইত্যাদি গাছলাগানো যেতে পারে।

(চ) সেনানিবাস ও পুলিশ লাইনেঃ- বড় ছায়াদানকারী গাছ ঘন করে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হয়। যেমন- মেহগিনী, বকুল, শিশু,কদম, ছাতিম,শিমুল, দেবদারু, কাজু বাদাম, তেলসুর, কড়ই, রেইনট্রি, আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর ইত্যাদি গাছ সেনানিবাস ও পুলিশ লাইনের ফাঁকা জায়গায় লাগানো দরকার এবং এদের আবাসিক এলাকায় হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ও অফিস প্রাঙ্গনে বেসরকারী এলাকায় যে সব গাছ লাগানোর কথা বলা হয়েছে সে সব গাছ লাগানো যেতে পারে।

৩. বনায়নের জন্য গাছের চারা উত্তোলন পদ্ধতি

যে কোনো বাগান তৈরির জন্য দরকার চারার। সুস্থ, সবল, সতেজ ও নির্ধারিত মানের চারা পাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন। যে জায়গায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চারা উৎপাদিত ও লালিত হয় তাকে নার্সারী বলে। নার্সারী স্থাপনের মূল লক্ষ্য হলো উন্নতমানের প্রচুর পরিমাণ চারা সঠিক সময়ে ন্যূনতম মূল্যে জনগণকে সরবরাহ করা। নার্সারী শুধু বীজ থেকে চারা উৎপাদনের কেন্দ্র নয়। নার্সারীতে বীজ থেকে চারাউৎপাদন ছাড়াও কলম থেকে চারা, রুপান্তরিত মূল বা শাখা থেকে গাছের বংশ বিস্তার করা হয়। এছাড়া অতি উন্নতমানের চারা উৎপাদনের জন্য টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা ও এখানে করা যেতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ নার্সারীতে চারা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সকল সরঞ্জাম, সার ও কীটনাশক সংরক্ষণ, রুগ্ন চারা পরিচর্যা, কম্পোস্ট তৈরি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। অনেক নার্সারীতে গ্রীণ হাউজ ও শীতাবাসের হট হাউজ এর ব্যবস্থা থাকে। প্রখর রোদ ও অতিরিক্ত বাতাসের হাত থেকে চারাকে বাঁচানোর জন্য গ্রীণ হাউজ তৈরীকরা হয়। গ্রীণ হাউজের নির্মাণশৈলী এমন যে সূর্যালোক বা প্রবল বাতাস সরাসরি চারাকে আঘাত হানতে পারে না। এছাড়া গ্রীণ হাউজে তাপ, জলীয়বাষ্প, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রন করা হয়। নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আর্দ্রতা নিশ্চিত এবং শীতের তীব্রতা থেকে চারা গাছকে বাঁচানোর জন্য হট হাউজ নির্মাণ করা হয়।

কাঠ, ফল, ফুল ও ঔষধি চারা বিভিন্নভাবে উত্তোলন করা হয়। প্রধানতঃ চরা উত্তোলনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, নিচে তা আলোচনা করা হলঃ

১। বীজ থেকে চারা উত্তোলন।
২। গাছের বিভিন্ন অংগ থেকে চারা উত্তোলন।

বীজ থেকে চারা উত্তোলনঃ এক্ষেত্রে বীজ হতে সরাসরি চারা উৎপাদন করা হয়। বীজ থেকে চারা উৎপাদন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। যথাঃ-

১। পলিপটে চারা উত্তোলন। ২। প্লাষ্টিকের পটে চারা উত্তোলন। ৩। চটের ব্যাগে চারা উত্তোলন। ৪। বেডে চারা উত্তোলন। ৫। মাটির খোরায় চারা উত্তোলন। ৬। রুট ট্রেইনারে চারা উত্তোলন।

গাছের বিভিন্ন অংগ থেকে চারা উত্তোলনঃ চারা তৈরির জন্য গাছের বিভিন্ন অংগ ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ ডাল, পাতা, মূল

ইত্যাদি। গাছের বিভিন্নঅংগ থেকে চারা উত্তোলন পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-
ক. কলম পদ্ধতি।
খ. কাটিং বা ক্লোনাল পদ্ধতি।
গ. বাডিং পদ্ধতি।
ঘ. টিস্যু কালচার পদ্ধতি।

৩.১ নার্সারীতে পলিপটে চারা উত্তোলন পদ্ধতি

নার্সারীঃ যে স্থানে চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারী বা বীজতলা বলে। নার্সারী দু'প্রকারের স্থায়ী ও অস্থায়ী। যে নার্সারীতে স্থায়ীভাবে চারা উত্তোলন করা হয় তাকে স্থায়ী নার্সারী বলে। এক বছর বা স্বল্প সময়ের জন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে বীজতলা স্থাপন করা হয় তা অস্থায়ী নার্সারী।কোথায় নার্সারী স্থাপন করা যাবে ?

১। সমতল বা স্বল্প ঢালু স্থানে যেখানে বর্ষার পানি জমবেনা ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাল।
২। স্বল্প ছায়া যুক্ত স্থানে তবে প্রচুর সূর্যালোক ও বায়ু চলাচল হবে প্রতিবন্ধকতাহীন।
৩। পানি সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা।
৪। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা।
৫। উর্বর বেলে-দোঁয়াশ মাটি।
কি পরিমান চারা উৎপাদন করা হবে তার উপর নির্ভর করবে নার্সারীর আয়তন।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতিঃ ভাল চারার জন্য প্রয়োজন ভাল বীজের। আর ভাল বীজ পেতে হলে প্রয়োজন ভাল 'মা' গাছ নির্বাচন। সোজাকাড বিশিষ্ট,সুগঠিত, সতেজ ও রোগমুক্ত গাছই সাধারণভাবে 'মা' গাছ। বীজ সংগ্রহের সময় নির্বাচিত 'মা' গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজের আকৃতিও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সংগ্রহের পদ্ধতি। গাছের তলা থেকে প্রথমদিকের বীজ কোন ভাবেই সংগ্রহ করা উচিৎ না, কেননা এ সমস্ত বীজ প্রায়শ্চই অপরিপক্ক বা রোগাক্রান্ত থাকে। বীজ সংগ্রহের আগে গাছের তলা ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। যে সমস্ত ফলের ত্বক রসাত্বক সে সমস্ত বীজ ফল সংগ্রহের সাথে সাথে বের করে নিতে হবে। এই সব বীজের আয়ুস্কাল কম । শুকনা ফলের বীজ রোদে শুকিয়ে খোসা ফেলে সংগ্রহ করতে হয়।

○ ঢাকনা বিহীন পাত্রে বীজ রাখা উচিৎ নয়।
○ বীজ রাখার স্থান যেন স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
○ বিভিন্ন বীজের অংকুরোদগম ভিন্ন তাই বীজ গুদামজাত করার আগে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন অংকুরোদগম কালের মধ্যে বীজ বপন না করলে চারা গজাবে না।

পলিপটে ভরাট করার জন্য মাটি তৈরীঃ পলিপটে ব্যবহারের জন্য যে মাটি ব্যবহৃত হবে তা তৈরীর সময় বিশেষ সাবধানতা ও সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই মাটি ভালভাবে শোধন করে, বিভিন্ন মৌল উপাদান নির্ধারিত হারে মেশানো দরকার। মনে রাখা উচিত, রোপিত চারা গাছ তার সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান পটের মধ্যের মাটি থেকেই সংগ্রহ করে। মাটিতে যদি খাদ্যোপাদান কম থাকে, পানি ও বায়ু চলাচল ঠিক মতো করতে না পারে তবে চারা তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে এবং কখনও সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠতে পারবেনা।

কর্দম রেণুযুক্ত এঁটেল মাটি কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি শুকিয়ে চাপের সৃষ্টি করে শিকড়কে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেয় না। এতে চারা বাড়ে না এমন কি তা মারাও যায়। এছাড়া নীচের স্তরের মাটি ও গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণভাবে ভিটিবালু উত্তম। প্রয়োজনে মাটি জমির উপরের ৬-৮ ইঞ্চি স্তর থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পটে ভরা অন্তত ৩ মাস পূর্বে মাটি সংগ্রহ করে নার্সারীর নিদিষ্ট স্থানে তা স্তুপকারে রাখতে হবে। মাটিতে যেন বেশি রোদ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কখনও উন্মুক্ত স্থানে মাটি রাখা উচিত নয় তা হলে মাটি শুকিয়ে যাবে এবং মাটির ভেতরের হিউমাস মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশার সুযোগ পাবে না। উপরন্তু মাটির ভেতরের নাইট্রোজেনও ব্যবহারোপযোগী হবে না। সংগৃহীত মাটি স্তুপকার করার আগেই ভাল করে গুঁড়ো করে চালনি দিয়ে চেলে পাথরের গুঁড়ো মাটির ঢেলা বা ঘাসের শিকড় ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

সংগৃহীত মাটির সঙ্গে শতকরা ৫ ভাগ হারে গোবর সার এবং ২৫ ভাগ হারে পাতা পচা সার বা কম্পোস্ট সার একসঙ্গে মিশিয়ে ভালকরে চেলে নিলে তবে তা পটে ভরার উপযুক্ত হবে। শুকনো গোবর সার বা কম্পোট সারও নিদিষ্ট মাপের চালুনি দিয়ে চেলে নেয়া দরকার। অনেকসময় গোবর সারের পরিবর্তে খৈল চিনিকল থেকে মাড়াইকৃত আখের তলানি ও তুষের ছাই ইত্যাদির মিশ্রণ পলিপটের মাটির সঙ্গে মেশানো যেতেপারে।

পলিপটে মিশ্রিত মাটি ভর্তি ঃ মাটির মিশ্রণ বলতে ভিটা মাটি, গোবর বা পঁচা সার এবং রাসায়নিক সার নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশানোকে বুঝায়। মাটি, গোবর বা পঁচা সার এবং টি,এস,পি ও এম,পি সার একত্র করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে স্তুপ করতে হবে। অতঃপর স্তুপকে কোদাল দিয়ে কেটে নতুন স্তুপ তৈরি করতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার করতে হবে। এভাবে মিশ্রণ তৈরী হল। মিশ্রণ তৈরী করার পর মিশ্রণের স্তুপকে খড়, কলাপাতা বা গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে ২০-৩০ দিন রাখতে হবে। মাটি ও গোবর শুস্ক হলে মিশ্রণ করার সময় হাল্কা পানি ছিটানো যায়। তা হলে মাটি ও গোবর পঁচে ভাল মিশ্রণ হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ মিশ্রণ যাতে বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হতে না পারে। ২০-৩০ দিন পরে মাটির মিশ্রণ ঢেলে পলি পটেভর্তি করা যায়। প্রয়োজনবোধে মাটির মিশ্রণ তৈরী করে স্তুপীকৃত না রেখেও ঢেলে সাথে সাথে পলিপটে ভর্তি করা যায়। ছিদ্রযুক্ত পলিপটে মাটি ভর্তি করতে হবে। পলিপট ফাঁড়া হলে চলবে না। বাম হাতে পলিপট ধরে ডান হাতে আস্তে আস্তে মাটির মিশ্রণ পলিপটে ঢালতে হবে। পট ভর্তি হলে হাত বা বাঁশের নল দিয়ে চাপ দিতে হবে। তারপর পলিপটের উপরিভাগ দুই হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে দুই তিন বার ঝাকুনী দিতে হবে। তারপর পলিপটে পুনঃমাটি ঢেলে পটটি কানায় কানায় ভর্তি করতে হবে। তা ছাড়া পলিপটে যথযথভাবে মাটি ভর্তি না করলে পটে পানি সিঞ্চন করলে মাটি নিচে নেমে যায় এবং চারার গোড়ায় পানি জমে চারা বৃদ্ধি কম হয়। গোড়ায় পঁচা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া পলিপটের উপরিভাগ সরটিং এর সময় ছিড়ে যায়। ফলে পলিপট নষ্ট হয়ে যায়।

বেড তৈরী ঃ মাটি ভর্তি পলিপট রাখার জন্য বেড তৈরী করা দরকার। বেড সাধারনত ৪০ লম্বা এবং ৪ প্রস্থের হয়ে থাকে। তবে জায়গার স্বল্পতায় বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে। নার্সারীর বেড সাধারনত পূর্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বি ভাবে হয়ে থাকে। যাতে বেডের প্রতি পাশে সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ে। বেড তৈরী জন্য প্রথমে জায়গার প্রাপ্ততা অনুযায়ী বেডের আকার নির্ণয় করা হয়। অতঃপর বেডের চার দিক দিয়ে খুটি বসাতে হবে। মাটি হতে খুটিগুলোর উচ্চতা পটের আকারের সাথে মিল রেখে রাখতে হবে। সাধারনতঃ ৬″X ৪″ পলিপটের জন্য মাটি হতে খুটির উচ্চতা ৪″, ১০″ X ৬″ পটের জন্য ৮″-৯″ এবং ১৬″ X ৯″ পটের জন্য ১২″ হলে চলবে। খুটি বসানোর পর বাঁশের কাইম বা বাতা দিয়ে বেডের চারদিকে আরাআড়ি ভাবে খুটির সাথে বেধেঁ দিতে হবে।

পলিপট বেডে স্থাপনঃ মাটি ভর্তি করার পর পলিপট বেডে রাখা হয়। পলিপট বেডে রাখার আগে বেডের মাটি ভালভাবে দুরমুজ করে সমান করতে হবে। অতঃপর পলিপট বেডের উপরে সোজা ভাবে রাখতে হবে। যে কোন এক পাশ হতে বেডে পট ভর্তি শুরু করতে হবে। একটি পলিপটের সাথে আরেকটি আট সাট করে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই যাতে পলিপট বাঁকা বা হেলানো ভাবে সাজানো না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।বাঁকা পলিপটে চারা বাঁকা হবে এবং দুর্বল হবে। পলিপটে উত্তোলিত আরা খুব ঠাসাঠাসি করে সাজানো উচিৎ নয়। এতে চারা নাড়াচাড়া করতেঅসুবিধা হয়, এমনকি এভাবে রাখলে চারার ক্ষতিও হতে পারে। কেয়ারীর প্রান্তের খুঁটি ও কাঠামো যথেষ্ট মজবুত হতে হবে যাতে তা পলিপটেরচাপ সহ্য করতে পারে, আর পটগুলিকে খাড়াভাবে ধরে রাখতে পারে। প্রতি মাসে একবার চারাগুলোর উচ্চতার ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে অর্থাৎ বড় চারা বড় চারার সাথে এবং ছোট চারা ছোট চারার সাথে পৃথক পৃথক কেয়ারীতে কিংবা একই কেয়ারীতে রাখা যাবে। অন্যথায় ছোট চারা বড় চারার নীচে পড়ে যাবে এবং দমিত হবে। মৃত ও রুগ্ন চারাগুলো বেছে ফেলতে হবে এবং এসব খালি পটে পুনরায় চারা রোপণ করতে হবে। ছোট চারায় সার দিয়ে বড় করতে হবে।

বীপ বপন ঃ বীজ বপনের আগে পলিপটে হাল্কা পানি দেওয়া ভাল। পানি দেয়ার কিছুক্ষণ পর যখন মাটি ফুরফুরে হয়ে যায় তখন বীজ বপন করা উত্তম। প্রথমে পলিপটে ছোট গর্ত করতে হবে। তারপর প্রতি গর্তে ২টি করে বীজ দিতে হবে। বীজ দেয়ার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। সাধারনতঃ বীজের আয়তন যত তত পরিমাণ মাটি বীজের উপর দিতে হবে। বীজের উপর মাটি বেশি পড়লে অর্থাৎ বীজ বেশি মাটির নিচে হলে অংকুরোদগম কম ও বিলম্ব হবে বা বীজ পঁচে যাবে বা আদো অংকুরোদগম হবে না। বীজ বপন করার পর পলিপট হাল্কা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতেহবে। অতঃপর বেডে নিয়মিত পানি সিঞ্চন করতে হবে।

চারা স্থানান্তর রোপণঃ অনেক সময় পলিপটে বীজ বপন না করে চারা রোপণ করা হয়। প্রথমে সীড বেডে চারা তৈরি করা হয়। চারা স্থানান্তরনের সময় হলে পলিপটে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করার আগে যে পলিপটে চারা রোপণ করা হবে সে পলিপটের বেডে হালকা পানি ভিজিয়ে এবংবেডে ছায়ার জন্য চালা দিতে হবে। যে সীড বেড বা ট্রে হতে চারা উত্তোলন করা হবে সে বেড বা ট্রেও হালকা পানি দিয়ে প্রথমে ভিজিয়ে নিতেহবে। একটি কাঠি দিয়ে চারা সমেত একখন্ড মাটি সীড বেড বা ট্রে হতে আলাদা করে হাতে নিতে হবে। অতঃপর সাবধানে চারার আগার পাতাধরে আস্তে আস্তে টান দিলে চারা উঠে যাবে। তারপর পলিপটে কাঠি দ্বারা গর্ত করে সে গর্তে চারাটি অতি সন্তর্পনে স্থানান্তর করে সাথে সাথে হালকা পানি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যেন পূর্বে চারাটি যে পর্যন্ত মাটির নিচে ছিল রোপণের সময়ও ততটুকু মাটির নিচে থাকবে। কোন অবস্থাতেই যেন চারার মূল পেচিয়ে বা এবরো থেবরো হয়ে না যায়। তাহলে চারার বৃদ্ধি ভাল হবে না। ৮/১০ দিন পর আচ্ছাদন সরিয়ে নিলে চলবে।

বীজতলার চারায় ছায়ার ব্যবস্থাঃ বীজ বপন অথবা চারা লাগাবার পূর্বে নার্সারী বেডের উপর আচ্ছাদন বা সেড দিতে হবে যাতে অংকুরিত বা রোপনকৃত চারা রৌদে মারা না যায়। বেশীরভাগ গাছের ক্ষেত্রেই অংকুরোদগমকালীন ছায়ার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা ছায়া মাটিতে প্রয়োজনীয়আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং রৌদ্র তাপের ক্ষতি থেকে কচি চারাকে রক্ষা করে। সাধারনতঃ সদ্য পুনঃ রোপিত চারা এবং ছোট চারার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ ছায়ার প্রয়োজন হয়। প্রজাতি ভেদে এ ছায়ার তারতম্য ঘটতে পারে। চারাগুলি নতুন

অবস্থায় একবার লেগে গেলে আর ছায়ার দরকার হবেনা বা আংশিক ছায়া থাকলেও চলবে। খড়, ছন, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি দিয়ে চালা তৈরি করে পূর্ণ ছায়া, আর বাঁশের বেড়া তৈরী করে আংশিক ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়। কেয়ারী বা বেডের উপরে ছায়ার জন্য তৈরী চালা বেডের চেয়ে প্রস্থে ৫০ সেমিঃ বড় হতে হবে। বেডের উপর ছায়ার চালা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এবং উত্তর দিকে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী ঢালু হবে। সূর্য তাপের প্রখরতা ভেদে বেডের চারার এক প্রান্তে পার্শ্ব ছায়ার প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমে বেডের চারদিকে প্রয়োজনীয় খুটি পোততে হয় । অতঃপর চালা উক্ত খুটির উপর রাখা হয়।

-পশ্চিমে লম্বা এবং উত্তর দিকে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী ঢালু হবে।সূর্য তাপের প্রখরতা ভেদে বেডের চারার এক প্রান্তে পার্শ্ব ছায়ার প্রয়োজন হতেপারে। প্রথমে বেডের চারদিকে প্রয়োজনীয় খুটি পোততে হয় । অতঃপর চালা উক্ত খুটির উপর রাখা হয়।

৩.২ নার্সারীতে চারা রক্ষণাবেক্ষণ ঃ নার্সারী বেডে বা পলিপটে বীজ বপন বা চারা রোপণ করার পর যথাযথ পরিচর্যা ও যত্ন করা প্রয়োজন। তা না করলে চারা উত্তোলন করা দূরহ। কাজেই বীজ বপন বা চারা রোপণের পর সুস্থ, সবল ও নীরোগ চারা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত নার্সারী পরিদর্শন ও নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে নার্সারীর অবস্থা অবলোকন করে যখন যে কাজ করা দরকার তা করতে হবে। কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই যে এ কাজের পর ঐ কাজ করতে হবে ইত্যাদি । নার্সারীতে যে সব পরিচর্যা ও যত্ন করতে হবে তা হলঃ

- ○ আচ্ছাদন বা শেড প্রদান।
- ○ মালচিং।
- ○ পানি সেচ
- ○ আগাছা বাছাই
- ○ অতিরিক্ত চারা তোলে ফেলা
- ○ সার প্রয়োগ
- ○ শ্রেণী করণ
- ○ খালি ব্যাগে বীজ বপন বা চারা রোপণ
- ○ শিকড় ছাটাই
- ○ হার্ডেনিং
- ○ গ্রেডিং করা
- ○ গোবর ছিটানো
- ○ মাটি হালকা করণ

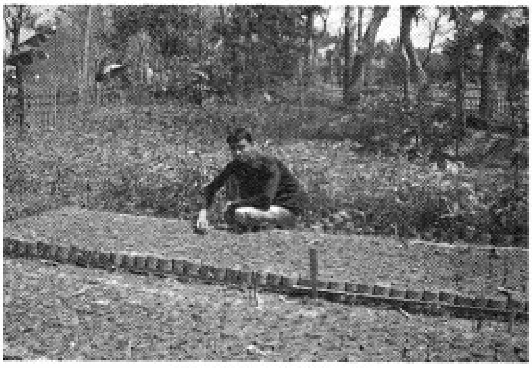

নার্সারীতে চারার পরিচর্যা

বীজতলায় চারায় পানি সেচঃ সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য পানি সেচ প্রয়োজন। বিশেষ করে শুস্ক মৌসুমে এর প্রয়োজন বেশী। সুষম পানি সেচের জন্য ঝাঝরাযুক্ত পানি পাত্র ব্যবহার করা উচিত। এত পানির অপচয় কম হবে। দিনের মধ্যভাগে বা কড়া রোদে পানি সেচ দেয়া উচিত নয়। বিকাল বেলাই পানি সেচের জন্য উত্তম সময়। তবে সময়ের সংকুলান না হলে অতি ভোরেও পানি সেচ দেয়া যেতে পারে। ছোট চারায় মৃদু সেচদেয়া উচিত।

পলিপটের চারা গাছ সরাণো এবং শিকড় ছাঁটাঃ পলিপটের চারার কিছু কিছু শিকড় অনেক সময় পটের বাইরে বেরিয়ে আসে। কাঁচি, বেড বাধারালো চাকুর সাহায্যে শিকড়গুলো ছাঁটাই করার পর এদের স্থানান্তর করতে হবে। কেননা শিকড় পেঁচিয়ে গেলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয় না।চারাগুলো সাধারতঃ এক মাস অন্তর স্থানান্তর করা প্রয়োজন যাতে পটের বাইরের শিকড় মাটিতে স্থায়ীত্ব লাভ না করে।

৩.৩ রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়া রোগ বালাই সৃষ্টির অনুকুল হওয়ায় নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বেশি দেখা যায়। নার্সারী চারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে । অনেক সময় রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশি হয় যার ফলে চারা ব্যাপকভাবে মারা যায়এবং এতে চারা উৎপাদন ব্যাহত হয়। কাজেই নার্সারীতে যাতে রোগ বালাই দ্বারা চারা নষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নার্সারী রোগসম্বন্ধে সমক্য ধারণা থাকতে হবে এবং ঘন ঘন পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে নার্সারীর চারার রোগবালাই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে হবে এবং যখন রোগের প্রাদুর্ভাব চোখে পড়বে তখনই ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার করতে হবে। তবে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই শ্রেয়।

নার্সারীতে রোগের প্রকারভেদঃ নার্সারীতে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা যায়। রোগের আক্রমনে নার্সারীর চারার দেহে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ ফুটে উঠে। সেগুলো হলঃ

১) রংয়ের বিকৃতি-চারার স্বাভাবিক রংয়ের পরিবর্তে অন্য রং প্রকট হয় । ডালে বা পাতায় দাগ পাড়ে।

২) পাতার বিকৃতি-পাতার অসংখ্য বিন্দুবৎ বা অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র হয়।
৩) শাখা প্রশাখা নেই। সমগ্র চারা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে বা পরে শুকিয়ে যায়।
৪) চারার অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।
৫) স্বাভাবিক গঠনে চারার বিকৃতি ঘটে।
৬) চারার কোন অংগ প্রত্যংগের ধ্বংস সাধন হয়।
৭) চারার পাতা অকালে ঝরে পড়ে।
৮) চারার দেহ কলার পচন ধরে।

কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাই দমন পদ্ধতিঃ পোকামাকড়, রোগবালাই ও নার্সারী অন্যান্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ছয়টি পদ্ধতি আছে

○ সোলারাইজেশন
○ প্রতিরোধ
○ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
○ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
○ জৈব নিয়ন্ত্রণ
○ রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

৩.৪ নার্সারীতে ছত্রাক দমন ঃ ড্যাম্পিং অফঃ নার্সারীতে চারা উৎপাদনে ড্যাম্পিং অফ এক বিরাট সমস্যা। Fusarium spp. নামক ছত্রাক এ রোগেরকারণ। বীজ এবং চারা উভয়ই এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে বীজ আক্রান্ত হলে চারা গজায় না। চারা গজানোর সাথে সাথে আক্রমণ হলে অংকুর নষ্ট হয়ে যায়। চারা আক্রান্ত হলে মাটির কাছাকাছি গোড়া টলে বা নেতিয়ে পড়ে। শিকড় আক্রান্ত হলে চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। বীজতলার মাটি ভিজা ও স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে এবং এর মধ্যে বাতাস চলাচল করতে না পারলে ড্যাম্পিং অফ রোগ হয়। রোগজীবাণু থাকলেও উপযুক্ত পরিবেশে এ রোগ হয় না। আকাশ বেশি দিন মেঘলা থাকলে এবং বর্ষা মৌসুমে এ রোগ বেশি হয় এবং তাতে অনেক চারা মারা যায়। নার্সারী চারায় যাতে ড্যাম্পিং অফ রোগ হতে না পারে সে জন্যও এ রোগ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

১) মাটির মিশ্রণ বিশুদ্ধ করে বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রে মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফরমালডিহাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।
২) কুপ্রাভিট বা ডায়থিন দিয়ে অংকুরোদগমের ট্রে ভিজিয়ে নিতে হবে।
৩) কচি চারায় বেশি পানি দেয়া যাবে না। এমনভাবে পানি দিতে হবে যাতে চারার মাটি স্যাঁত স্যাঁতে না হয়।
৪) চারার উপরের শেড সরিয়ে ফেলতে হবে।
৫) বেশি ঘন করে বীজ বপন করা যাবে না।
৬) বীজতলা সুনিস্কাশিত রাখতে হবে যাতে পানি দাড়াতে না পারে।

নার্সারীর চারা ড্যাম্পিং অফ রোগ বা ছাত্রাক আক্রান্ত হলে ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে। কুপ্রাভিট বা ডায়থিন এম ৪৫ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

নার্সারীতে কীট পতঙ্গ বালাইঃ যে সব প্রাণী উদ্ভিদের বা প্রাণীর এমনকি মানুষের ক্ষতি সাধন ও রোগের সৃষ্টি করতে পারে তাদেরকে কীট পতঙ্গ বালাই বলে। পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ নার্সারীর চারার অনেক ক্ষতি করে । এদরে প্রজনন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি বলে এরা অতি তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে যায়। যথা সময়ে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না নিলে অল্প সময়ের মধ্যে নার্সারীর চারার ক্ষতি হতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের নার্সারীর ক্ষতিকারক পোকা মাকড় রয়েছে। এদের নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যায়ঃ

১) কাটুই পোকা
২) ককশেফার
৩) উইপোকা এবং পিপিলীকা
৪) ক্রিকেট এবং মৌল ক্রিকেট
৫) পাতাভোজী পোকা মাকড়
৬) রস শোষক পোকা মাকড়

প্রাকৃতিক কীটনাশকঃ কোন কোন গাছের বিষাক্ত পাতা ও বীজ পোকামাকড় দমন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম গাছের বীজ, মরিচবীজ, আতা ফলের বীজ, তামাক পাতা ও কান্ড এবং অন্যান্য অনেক গাছের বীজ, পাতা ও কান্ড প্রাকৃতিক কীটনাশক তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তামাক ব্যতীত অন্যগুলো মানুষের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। সাধারণত প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহারের ২-৩ দিন পরে পোকা মারা যায়.তাই পোকার সমস্যা দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত। আগে ভাগে ছিটিয়ে দিলে চারার ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করা যায়। প্রাকৃতিক কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

পোকামাকড়ে আক্রান্ত হলে চারায় রাসায়নিক কিটনাশক প্রয়োগ করা যায়, যেমন- মেলাথিয়ন, ডায়াজিনন, ডেচিস, সেভিন, ডারসবান ইত্যাদি।

৪. আগাছা বাছাই, ছত্রাক ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ

পলিপটে উত্তোলিত চারাগুলো সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ছোট থাকতেই শিকড়সমেত আগাছা তুলে ফেলতে হবে এবং যতবার প্রয়োজন হয়, ততবারই এ কাজটি করতে হবে। প্রয়োজনে বীজ তলায়, বীজধারে এবং চারাগাছে ছত্রাক নিবারক ও কীটনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে। এ জন্য কীটনাশক ও ছত্রাক নিবারক প্রয়োগ বিধি যথাযথভাবে পালন করা প্রয়োজন।

৫. বাগান সৃজন প্রক্রিয়া, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

বাগান সৃজন পদ্ধতিঃ- যেকোন ধরনের বাগান সৃজনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) স্থান বা জমি নির্বাচন।

(খ) প্রস্তাবিত বাগান এলাকা জরিপ।

(গ) ভূমি ব্যবহারের চুক্তিনামা সম্পাদন।

(ঘ) প্রস্তাবিত বাগানের পরিকল্পনা।

(ঙ) বাগানের মডেল নির্বাচন।

(চ) জনসাধারণকে উদ্ধুদ্ধ করণ, দলগঠন ও চুক্তিনামা সম্পাদন।

(ছ) প্রস্তাবিত বাগান এলাকা প্রস্তুত।

(জ) স্ট্যাকিং।

(ঝ) সেবক গাছের বীজ বপন।

(ঞ) গর্ত খনন।

(ট) সার প্রয়োগ।

(ঠ) চারা লাগানোর প্রয়োজনীয় দূরত্ব।

(দ) চারা সংগ্রহ ও রোপণের সময়।

(ধ) চারা রোপণের পদ্ধতি।

(ন) সরাসরি বীজ বপন ও রোপণ।

চারা লাগানোর সময়ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারা বছরই গাছ লাগানো যেতে পারে। তবে বর্ষা মৌসুমই গাছ লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়। এ মৌসুমে গাছ লাগালে গাছের পরিচর্যা করতে সময় কম লাগে। কোনো কোনো বছর বর্ষা প্রলম্বিত হয়। এ রকম বছরে গাছ লাগানোর সময়ও বেড়ে যায়। যেখানে পানির সুব্যবস্থা রয়েছে সেখানে বর্ষা মৌসুমের আগে বা পরেও গাছ লাগানো যেতে পারে। গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময় হলো বিকাল বেলা। কেননা বিকালে সূর্যালোকের প্রখরতা কম এবং রাত্রির দীর্ঘ সময়ে লাগানো চারা বিশ্রাম পায়।

চারা লাগানোর স্থানঃ গাছ লাগানোর আগে স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্থান নির্বাচনের পর বর্ষা শুরুর আগে জায়গার আগাছা সরিয়ে দেড় ফুট দীর্ঘ,দেড় ফুট প্রস্থ এবং দেড় ফুট গভীর একটি গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় উপরের মাটি একদিকে ও গর্তের ভিতরের মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। মাটির সব আগাছা, ঘাস ও শিকড় বেছে ফেলে সব মাটিকে গুড়ো করতে হবে। এরপর সম পরিমাণ গোবর সার বা পঁচা পাতার সার ঐ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্তটিকে ভরাট করতে হবে। মাটি গর্তে ভরাট করার সময়ে উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত প্রতি ১ কেজি শুকনো গোবর, টিএসপি ২০ গ্রাম, এমপি ১০ গ্রাম, ইউরিয়া ২০ গ্রাম মাটিতে মেশাতে হবে। অনেকের মতে ইউরিয়া সার চারা রোপণের আগে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং পরবর্তী সময়ে লাগানো চারার কোন উপকারে আসে না। গর্তমাটি দিয়ে ভরাট করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে জমির সাধারণ সমতল থেকে ভরাট মাটি যেন দুই ইঞ্চি উঁচু থাকে। এতে মাটিতে বাতাস ঢুকতে পারে এবং মাটি বসে যাবে না। এভাবে তৈরী গর্ত দিন পনের খালি রেখে দিতে হবে।

চারা নির্বাচন ও পরিবহনঃ নার্সারীতে তিন প্রকার চারা পাওয়া যায়। পলিব্যাগে বা অন্য পাত্রে, মাটির বলসহ চারা, শিকড় বা ষ্টাম্প আকারে। কি ধরনের চারা নির্বাচিত হবে তার উপর নির্ভর করে নার্সারী থেকে লাগানোর জায়গায় চারা পরিবহন ও পরিবহনকালে চারার পরিচর্যা। পলিব্যাগের চারা পরিবহন সুবিধাজনক।পাত্রে গজানো চারা বা মাটির বলসহ পরিবহন ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ ধরনের চারা পরিবহনে বেশি যত্নশীল হতে হয়। ষ্টাম্প বা শিকড় নেওয়া এবং লাগানো বেশ সহজসাধ্য।

নার্সারী থেকে চারা নির্বাচনকালে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও গাঢ় ঘন সবুজ পাতা বিশিষ্ট চারা বেছে নিতে হবে। পলিব্যাগের চারা হলে ব্যাগের বাইরে যেসব শিকড় বেরিয়ে এসেছে তা কেটে ফেলতে হবে। ব্যাগের মাটি যেন পরিবহনকালে ভেঙ্গে না যায় তা

নিশ্চিত করতে হবে। মাটির বলসহ চারা নিলে বলটি ভিজা চট দিয়ে মুড়ে ভাল করে বেঁধে নিতে হবে, যেন পরিবহনকালে বলটা ভেঙ্গে না যায়। মনে রাখতে হবে চারার শিকড় অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মাটি ভেঙ্গে গেলে শিকড়ের মুকুট ছিঁড়ে যায়, ফলে চারা লাগানোর পর চারা যথাযথভাবে মাটি থেকে রস গ্রহণ করতে পারে না। মাটি ছাড়া চারা নিতে হলে নার্সারী বেডকে চারা তোলার আগে ভালভাবে ভিজিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটিসহ চারা তুলতে হবে পরে উঠনো চারার শিকড় প্রথমে পানিতে ডুবিয়ে মাটি আলগা করে ফেলতে হবে। সম পরিমাণ কাদামাটি ও গোবরের মিশ্রণে চারার শিকড় ডুবিয়ে ভিজিয়ে ১৫-২৫ টি বান্ডিল বেঁধে চারার শিকড় এর উপর ভেজা চট দিয়ে মুড়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে যেন পরিবহনের সময় বান্ডিল খুলে না যায়। কাদামাটি ও গোবরের যে মিশ্রনের কথা বলা হয়েছে তা এমনভাবে তৈরী হবে যে সেটি যেন শিকড়ের উপর একটা আস্তর হিসেবে থাকতে পারে।

চারা যদি বেশি দূর থেকে গাড়িতে পরিবহন করা হয় তবে দেখা যাবে চারার পাতা নেতিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সাথে সাথে না লাগিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় পানির ছিঁট দিয়ে চারাকে ২-৩ দিন রেখে সতেজ হলে পরে লাগাতে হবে। আনার সাথে সাথে চারা লাগানো যাবে না।

গর্তে চারা/স্টাম্প/বীজ স্থাপন

চারা ঃ পলিব্যাগের চারা গর্তে লাগানোর আগে ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে পলিথিন ব্যাগের পাতলা পরত কেটে নিয়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে।চারার গোড়ার মাটি যেন অক্ষত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই পলিথিন ব্যাগের তলা না কেটে চারা গর্তে লাগানো যাবে না।

প্রথমে তৈরী গর্তে ব্যাগের মাপে সমমাপের গর্ত করে তার মধ্যে ব্যাগবিহীন চারাটি স্থাপণ করতে হবে। চারার চার পাশে মাটি শক্ত করে চেপে দিতে হবে। মাটি শক্ত করে চেপে না দিলে পানি শিকড়ের গোড়ায় জমে শিকড় পঁচিয়ে দেবে এবং চারাটি মরে যাবে। চারার গোড়ার মাটি এমনভাবে চাপতে হবে যেন চারার চারপাশের মাটি সমতল থেকে একটু উপরে এবং ঢালু অবস্থায় থাকে। এতে চারার গোড়ায় পানি জমার সম্ভাবনা থাকে না।

শিকড় সমেত মাটি বিহীন চারা লাগানোর সময় উপরে বর্নিত পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে গর্তে লাগানোর সময় শিকড় যেন সোজাভাবে থাকে, অর্থাৎ তা যেন বেঁকে না যায়। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে নার্সারীতে চারাটির যতটুকু অংশ মাটির নিচে ছিল পুনরায় রোপণের সময়ও যেন ঠিক ততখানি মাটির নিচে থাকে । চারা বেশি গভীরে রোপণ করলে মূল শিকড় মরে যায় অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

স্টাম্প বা শিকড়ঃ সাধারণত ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি শিকড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমাণ কান্ড দিয়ে ষ্টাম্প তৈরী করা হয়। ষ্টাম্প বা শিকড় পুরা বর্ষা শুরু হওয়ার আগে কিন্তু মাটিতে আর্দ্রতা আসার পর লাগাতে হবে। স্টাম্প লাগানোর জন্য উপরের বর্ননা মতো আগে গর্ত করে রাখার প্রয়োজন হয় না। মৌসুমের শুরুতে প্রথম এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর শাবলের চোখা অংশ দিয়ে স্টাম্পের শিকড়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে এক ইঞ্চি পরিমান বেশি গর্ত করতে হবে। এই গর্তে স্টাম্প বসিয়ে চারিদিকে মাটি শক্ত করে চেপে দিতে হবে। গর্তে স্টাম্প লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কান্ড ও শিকড়ের সংযোগস্থল (কলার) মাটির সমান্তরাল থাকে। বর্ষার লাগানো ষ্টাম্পের গোড়ায় যেন পানি না জমে তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে সাধারনত সেগুন, জারুল ও শিমুলের ষ্টাম্প লাগানো হয়ে থাকে।

বীজঃ চারা ছাড়াও প্রয়োজনে সরাসরি বীজ বপণ করে গাছ লাগানো যেতে পারে। এভাবে গাছ তৈরী করতে হলে আগের বর্ণনা অনুযায়ী গর্ত তৈরীকরতে হবে বা ১ ইঞ্চি ১ ইঞ্চি ১ ইঞ্চি পরিমান জায়গার মাটি ভালভাবে তৈরি করে তাতে গোবর বা জৈব সার অথবা রাসায়নিক সার মিশিয়ে সেখানে সরাসরি বীজ বপন করতে হবে।

চারার মাপ ঃ কি মাপের চারা লাগাতে হবে এ নিয়ে মত দ্বৈধতা আছে । অনেকে মনে করেন ৬ ফুটের কম উচ্চতার চারা লাগানো উচিত না। এমতের পেছনে বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নাই। বড় বা ছোট কি মাপের চারা লাগাতে হবে তা নির্ভর করবে কি প্রজাতির চারা লাগানো হবে, কোথায় লাগানো হবে তার উপর। একটা সাধারন কথা মনে রাখা দরকার- ছোট একটি শিশু সহজে নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বড়শিশু তা পারে না। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি তাকে সহজে নতুন পরিবেশের আচার আচরণ ও ভাষা আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে । বয়স্কের ক্ষেত্রে একই জিনিস তার বুদ্ধি, বিবেচনা ও নিজস্ব মননশীলতার দ্বারা কষ্ট করে আয়ত্তে আনতে হয়। চারা গাছের আকারের ক্ষেত্রেও এ সত্যটি প্রযোজ্য।

সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ কার্যক্রম

৬. রোপিত চারার পরিচর্যা

মাটির যত্নঃ চারা লাগানোর পর জায়গাটা ভালো করে ভিজিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। চারা লাগানোর পর লক্ষ্য রাখতে হবে চারার চার পাশের মাটি যেন সমতল থেকে অল্প উঁচু থাকে। এতে গোড়ায় পানি জমে চারা পঁচে যাবে না । চারা লাগানোর পর মাটি ভালো করে ভিজিয়ে দিলে আলগা মাটি ভালো করে বসে যায়। এতে চারার মাটি থেকে রস গ্রহণ ও মূলের মূলরোম বিস্তার সহজ হবে। চারা লাগানোর পর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সকালে বা বিকালে চারায় পানি দেওয়া প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে চারার গোড়ায় যেন পানি না জমে। প্রখর রোদে চারায় পানি দেয়া উচিত নয়,এতে চারার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। চারার গোড়ার মাটি যাতে শুকিয়ে, সরে এবং ধ্বসে না যায়, সে জন্য বিভিন্ন ধরনের শুকনো খড়কুটো, ঘাস,কচুরিপানা, লতাপাতা দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে রাখতে হবে তাছাড়া এতে পানি সেচের মাত্রা ও পরিমাণ কমবে, আগাছা দমন করা যাবে এবং চারার গোড়ার মাটি নরম থাকবে। সর্বোপরি ব্যবহৃত জৈব পদার্থ ক্রমান্বয়ে চারার খাদ্যে পরিনত হবে। এই ব্যবস্থাকে মালচিং বলা হয়।

চারা লাগানোর পর গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। মাটি আলগা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে শিকড় যেন কেটে না যায়। মাটি আলগা করার সময় মাটিতে অল্প পরিমাণ সার প্রয়োগ গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়। গাছের আকার অনুযায়ী গোড়া থেকে ১-৩ ফুট দূরে গাছের চারিদিকে রিং করেও সার দেয়া হয়। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে বেশি দূরে রিং করতে হবে। অনেক সময় চারার গোড়ার চারিদিকে ৬-৯ ইঞ্চিদূরে কাঠি দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে সার প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া মিশ্রিত জৈব সার ব্যবহার করা ভাল। তবে গাছের বৃদ্ধির সহায়তার জন্য রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসায়নিক সার ব্যবহারকালে সর্তক থাকতে হবে যেন তা গাছকে সরাসরি স্পর্শ না করে। রাসায়নিকসার প্রয়োগ করার সময় গাছের গোড়া উঁচু করে দেওয়া মাটি সরিয়ে গোড়া থেকে ৮-৯ ইঞ্চি গভীর নালা করে ২৫-৩০ গ্রাম এন, পি, কে, সমানভাবে ছড়িয়ে মাটি দিয়ে নালা ভরে গাছের গোড়ার মাটি আগের মত উঁচু করে দিতে হবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের পর অবশ্যই মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে তা না হলে প্রয়োগকৃত সার গাছের কোনো উপকারে আসবে না। বনজ গাছে চারা লাগানোর ২-৩ বছর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটা ব্যয় বহুল বিধায় অনেক ক্ষেত্রে করা হয় না। তবে কম উর্বর মাটিতে দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ বা সার কাঠের বাগানে সার প্রয়োগ করতে হবে। এত গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা ঃ চারার উপর বড় কোনো ডাল থাকলে তা ছেঁটে দিতে হবে এবং এর ফলে চারাটি ছায়ামুক্ত হবে। পর্যাপ্ত রোদ পাবে।বৃষ্টির পরে উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি চারার উপর পড়বে না। রাস্তার পাশে রোপিত চারা অনেক সময় ধুলায় ঢেকে থাকে। ফলে পাতার সালোকসংশেষনের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাই মাঝে মাঝে পানি দিয়ে পাতা ধুয়ে দিতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ আগাছা চারার জন্য একটি বড় শত্রু। সার প্রয়োগ ছাড়াও লাগানো চারার গোড়ায় মাটি আলগা করে গোড়ার কাছে জন্মানো আগাছা তুলে ফেলতে হবে। আগাছা বাছাই প্রথম বছরে অন্তত তিনবার (জুলাই-আগষ্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং মে-জুন) দ্বিতীয় বছর দুই বার (জুলাই_আগষ্ট ও মে-জুন) এবং তৃতীয় বছর একবার (মে-জুন) করলে ভাল হয়। তোলা আগাছাকে সবুজ সারে পরিনত করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে। আগাছা পরিস্কার করার জন্য হার্বিসাইডও ব্যবহার করা হয় তবে এটা ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

চারা রক্ষা করা ঃ গাছ লাগানোর পর আরো যেটা প্রয়োজন তা হলো চারা গাছকে ঝড় তুফান, হিম, বজ্রপাত, অতিরোদ, পানির স্বল্পতা বা আধিক্য,আগুন, গৃহপালিত পশুপাখি, মানুষ, যানবাহন, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা । কারণ এ সব অবস্থা গাছকে ধ্বংস করতে অথবা গাছের উপর মারাত্মক দৈহিক আঘাত হানতে পারে। চারা যাতে তার শাখা প্রশাখা ও কান্ডের ভারে বা বাতাসে হেলে বা পড়ে না যায় এবং গরু, ছাগলে নষ্ট না করতে পারে সেজন্য খুঁটি পুঁতে চারাটি খুঁটির সাথে

শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। তবে খুঁটি পোতার ব্যবস্থা গাছের অবস্থান, আকার এবং জাতের উপর নির্ভর করে। খুঁটি বেশি লম্বা হওয়া উচিত নয়। ৪-৫ ফুট হলেই যথেষ্ট। প্রয়োজনে একটি খুঁটির পরিবর্তে দু'টি খুঁটি লাগতে পারে। ঢালুতে লাগানো গাছের জন্য খুঁটি কৌনিকভাবে স্থাপন করতে হবে। অনেক সময় বড় গাছকে স্থিতিশীল করার জন্য খুঁটির পরিবর্তে দড়ি দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে দিতে হতে পারে। খুঁটির সঙ্গে গাছ বাঁধার জন্য সুতলী/দড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাঁধার ফলে গাছ যেন আঘাত না পায়। বাতাসের গতি খুব একটা বেশি না হলে, এক বছর পর খুঁটি সরিয়ে ফেলা উচিত।

অত্যাধিক শীত থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য পাট, হেসিয়ান,ক্যানভাস, ইত্যাদি দিয়ে স্ক্রিন তৈরী করা হয়ে থাকে। সিলেট এবং দিনাজপুর ছাড়া বাংলাদেশের অন্যত্র এ সমস্যা দেখা যায় না। তবে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য সাধারনত বাঁশের ঘেরা বেড়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও ইটের ঘেরা বেড়া, কাটা তারের ঘেরা, বা লোহার তৈরী খাচা দেওয়া হয়। ঘেরা বেড়া বা খাঁচা দিয়ে গাছ লাগান ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। মনে হতে পারে বাঁশের আর কি দাম? কিন্তু একটা চারা গাছে ঘেরা বেড়া দিতে ন্যূনতম দুটো বড় আকারের বাঁশের প্রয়োজন, এ ছাড়া শ্রমতো আছেই।একটি চারার জন্য দুটি বাঁশের ব্যবহার করা হলে, প্রচুর চারা লাগাতে বা বড় আকারের বাগান তৈরী করতে প্রচুর সংখ্যক বাঁশের প্রয়োজন হবে।

ছাঁটাই ঃ চারা রোপণের কয়েক বছর পর ভবিষ্যত বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য গাছের ছাঁটাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শাখা বৃদ্ধির গতিপথ ছোট অবস্থায় শাখা এবং কুঁড়ি ছেঁটে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। রোগ ও পোকা মাকড়ে আক্রান্ত এবং আঘাতপ্রাপ্ত বা ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া অঙ্গ ছেঁটে ফেলতে হয়।অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা অথবা অপছন্দনীয় আকৃতির কারণেও গাছ ছাঁটাই করা হয়। জ্বালানী কাঠ, খুঁটি, পশুখাদ্য অথবা মালচিং দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং দন্ডায়মান শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করাও ছাঁটাইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। মৃত অথবা মৃত প্রায় শাখা-প্রশাখা ছেঁটে ফেলা অত্যাবশ্যক কারণ এসব গাছে পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের সহায়ক। ভাঙ্গা শিকড়, যেখানে ভেঙ্গে গেছে, সেখানে কেটে ফেলে মাটিদিয়ে ঢেকে দিতে হবে। যে সব ডাল একে অপরকে অতিক্রম করে গেছে তাদের মধ্য থেকে এমনটিকে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে যেটি গাছের মুকুটের কোনো উপকারে আসে না। সে সব ডাল মিলে ফর্ক অথবা ছোট কোন বিশিষ্ট আকার ধারণ করে সে সব ডাল ছেঁটে ফেলে দেয়া উচিত নইলে পরে তারা নিজেরা আপনা আপনি ভেঙ্গে গাছের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ছোট গাছ ছাঁটাইয়ের জন্য এক ধরনের বিশেষ কাঁচি ব্যবহার করা হয়। ছোট গাছের বেলায় সবচেয়ে নীচু ডাল দিয়ে ছাঁটাই শুরু করা হয়, বিশেষ করে যে ডাল কান্ড থেকে সোজাসুজি অথবা বেশি কৌণিকভাবে বেরিয়ে এসেছে। মুকুট থেকে ছোট ডালপালা কাটা কোনো সমস্যা নয় তবে কান্ড থেকে বেরিয়ে আসা ডালপালা কাটার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। গাছ যে মৌসুমে সবচেয়ে বৃদ্ধি পায় তার আগেই ছাঁটাই শেষ করতে হবে। ডালের কলারের ঠিক বাইরেই যেন কাটা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

বড় গাছের ডাল কাটার জন্য এক ধরনের বিশেষ ধারালো করাত ব্যবহার করতে হবে। কাচি অথবা ছুতারের করাতে কাজ হবে না। ছুতারের করাত শুকনো কাঠ কাটার জন্য তৈরী এবং এটি কাঁচা কাঠে আটকিয়ে যাবে। করাত দিয়ে বড় গাছের ডাল ছাঁটাইয়ের জন্য আলাদাভাবে তিন বার কাটার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে, যেখানে শেষ কাটা হবে তা থেকে এক ফুট দূরে নীচে থেকে আধাআধি কাটতে হবে। দ্বিতীয় কাটা পড়বে প্রথম কাটার দুই/তিন ইঞ্চি বাইরে এবং এবার এমন ভাবে কাটতে হবে যাতে বেশির ভাগ ডাল কাটা যায় এবং ডাল লম্বালম্বিভাবে ফেটে নাযায়। শেষ বার কাটতে হবে ডালের কলারের ঠিক বাইরে।

বাছাই কাটা ঃ সাধারনত চারা গাছ রোপণের পাঁচ বছর পর প্রথম ঘনত্ব দূরীকরণ বা বাছাই কাটার কাজ হাতে নেয়া হয়। অর্থাৎ সারিতে একটা গাছবাদ দিয়ে একটা গাছ কাটা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে রোগা অথবা মরা অথবা আধমরা গাছ কেটে বাছাই কাটার কাজ হয়। এতে গাছ প্রচুর আলো বাতাস পায় এবং দ্রুত বেড়ে উঠে। তারপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বাগানের গাছের অবস্থা বুঝে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দফা বাছাই কাটা করা যেতে পারে। বাছাই কাটার ফলে গাছের যেমন পরিচর্যা হয় তেমনি গাছ থেকে ভাল পরিমানের কাঠও পাওয়া যায়।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ চারা রোপণের প্রথম বছরে শতকরা একশো ভাগ জীবিত চারা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কারণে অন্তত শতকরা দশ ভাগ মারা যায়। তাই যেখানে চারা মারা যায় সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে নতুন চারা রোপণের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বড়মাপের চারা লাগানোই বাঞ্ছনীয়। তাহলে আগে লাগানো চারার সঙ্গে সমতা রক্ষা করা যায়। তবে বড় চারা লাগানোর ব্যাপারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।